স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম

এ, এস, এম, আবদুল হালিম

"সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
o o o o
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।"

মাতৃভূমি মায়ের সমান। মাতৃভূমি তাই সবার প্রিয়। এ দেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক মনে করি। মাতৃভূমির সৌন্দর্য অতুলনীয়। এর দান অপরিসীম। তাই এ দেশের বুকে মৃত্যুবরণ করাও পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতা দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। যে জাতি পরাধীন সে জাতির কোন গৌরব নেই। স্বাধীনতা একটি জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। তাই জাতির জীবনে স্বাধীনতার সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। তাই বোধ হয় কবি অনুভব করেছেন–

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।"

আমরা কি জানি আসলে স্বাধীনতা কি? আমরা কি স্বাধীনতা বলতে শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বুঝি? স্বাধীনতা বলতে কি স্বেচ্ছাচারিতা বুঝি? স্বাধীনতা বলতে কি শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কথা বুঝায়? আসলে কিন্তু তা নয়। স্বাধীনতার অর্থ আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে "সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে কোন ব্যক্তির উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকার অবস্থাকে বুঝায়।" স্বাধীনতার নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিক রয়েছে। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা মানুষের পছন্দ ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধের অনুপস্থিতিকেই বুঝায়। কোন ব্যক্তি কেবল তখনই স্বাধীন হতে পারে যখন সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। অধ্যাপক ঐ. উ. ঔ. উমফণ বলেন স্বাধীনতা হলো "Freedom of the

---

* পরিচালক (বিপনন), বাংলাদেশ জুট মিল্‌স কর্পোরেশন

individual to express without external hindrances of personality" কিন্তু অপরিসীম স্বাধীনতা আদৌ কোন স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা কখনো নিয়ম-কানুনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে বুঝায় না। স্বাধীনতা চূড়ান্ত এমন কিছু নয়, বরং আপেক্ষিক মাত্র। ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করবে, এরূপ চূড়ান্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, এর নাম অরাজকতা বা নৈরাজ্য। এটা সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী ব্যক্তিগণ সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু সমাজের দুর্বলতর সদস্যগণের আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না।

সুতরাং সত্যিকারের স্বাধীনতার অর্থ হল মানুষের আচরণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা। মেকিনি লিখেছেন, "Freedom is not the absence of all restraints but the substitution of rational ones for the irrational." স্বাধীনতার সকল বিধি-নিষেধই স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিকুল নাও হতে পারে। আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার স্বার্থে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তিকে যদি ডাকাতির জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহলে মনে করা উচিৎ নয় যে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সমাজের কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে যদি কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় তবে তা স্বাধীনতার জন্যই প্রয়োজন। অতএব, সংশ্লিষ্ট জনগণের দ্বারা সমর্থিত বিধি-নিষেধ স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে না বরং এর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এটা স্বাধীনতার ইতিবাচক দিক। তবে কেবল অযৌক্তিক বাধা-নিষেধ দূর করা হলেই যে স্বাধীনতা রক্ষিত হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। যদি মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, কেবল তখনই স্বাধীনতা সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Liberty, therefore, is a product of rights." অতএব মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতা রক্ষার লক্ষ্যে যথাযথ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। প্রয়োজন আইনের শাসন। কারণ আইন স্বাধীনতাকে সযত্নে লালন-পালন করে। কোন আইন অমাণ্যকারী সন্ত্রাসী বা বিশেষ গোষ্ঠীর চক্রান্তে সাধারণ জনগণের স্বাধীনতা ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে আইন জনগণের অভিভাবক রূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যে কোন চক্রান্ত থেকে জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে।

আইনের অনুপস্থিতি অথবা আইন অমাণ্যকারীকে সন্ত্রাসী/নৈরাজ্যবাদী বললে ভুল হবে না। নৈরাজ্যবাদের আভিধানিক অর্থ শাসনবিহীন অবস্থা। নৈরাজ্যবাদ এমন এক মতবাদ যা যে কোন ধরনের সরকারী কর্তৃত্বকেই অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। নৈরাজ্য মতবাদ থেকেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম। আমরা আজ সন্ত্রাসের কবলে। সন্ত্রাসী আমাদের চারপাশে, সকল শুভকাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কতিপয় সন্ত্রাসী। সন্ত্রাস আজ বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। শিক্ষাঙ্গনে

সন্ত্রাস তরুণ শিক্ষার্থীর আলোকোজ্জ্বল ভবিষৎকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে সন্ত্রাসীর কাল হাত দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। নাগরিক জীবন সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত। এসব কিছু জাতির জন্য কল্যণকর নয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির যে আশা জাতির মনে কাজ করেছিল তা সন্ত্রাসীরা নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সন্ত্রাসের এ অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে সন্ত্রাসীদের গতিপথে। ভেঙ্গে দিতে হবে তাদের বিষদাঁত। যে সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ লাভের সুযোগ পেয়েছে তা সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ব্যাহত হতে দেয়া যায় না। আজ মানুষ যদি জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তবে জাতির জীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। সেজন্য গণতন্ত্রের সুষ্ঠু লালনের জন্য এবং গণতন্ত্র থেকে সুফল পাওয়ার মানসে নাগরিক জীবনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতেই হবে। আসুন সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি সন্ত্রাসবাদ আর নৈরাজ্যবাদ নিপাত যাক।

দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। পরিস্থিতির জটিলতা মোকাবিলা করার জন্য সরকার সন্ত্রাস দমন আইন জারী করেছেন। কিন্তু সন্ত্রাস দমন শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এতে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। গণতন্ত্রকে প্রতিপালন করতে হবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। নাগরিকদের ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। সকলের প্রয়োজন ধৈর্য আর সহনশীলতা। সহনশীল মনোভাব না হলে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দল-মত নির্বিশেষে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের বিধান করতে হবে। সন্ত্রাসের মুল কারণ নিরুপণ করতে হবে এবং তার মুলোৎপাটন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত হলে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর হবে। জাতির মেরুদন্ড সোজা থাকবে। শিল্প কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ত্রাসমুক্ত হলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তবেই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জনগণ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তেমনি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা তাই লব্ধ এই গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়ে স্বভাবতই আনন্দিত ও আশান্বিত। আনন্দিত এ কারণে যে স্বৈরশাসনের নিস্পেষণ থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। আর আশান্বিত এ কারণে যে, জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া এখন সম্ভব হবে। নাগরিক জীবনের সর্বাঙ্গীন সুযোগ-সুবিধা বিধানের অনুকূল পরিবেশ এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ থেকেই সম্ভব। তাই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে জাতি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যথাযথ বাস্তবায়নের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধু সন্ত্রাসই নয়,দুর্নীতির বিষবাষ্পে ছেয়ে গেছে জাতি। পৃথিবীর বহু দেশেই দুর্নীতির কম বেশী বিস্তার ঘটেছে। সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে: স্কুল-কলেজে দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দুর্নীতি, অফিস-আদালতে দুর্নীতি, দুর্নীতি সর্বত্র।

সরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং সাধারণ কর্মী অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রতিবেশী ভারতে সি, বি, আই নামক তদন্তকারী সংস্থা সম্প্রতি সে দেশের প্রভাবশালী নানা দলের বহু খ্যাতনামা নেতার নানা দুর্নীতির সন্ধান পাচ্ছে তাদের পরিচালিত তদন্তে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। তবে এ সকল দেশে আইন সবার জন্য সমান। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের নেতারাও ঐ তদন্ত ও বিচার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না।

আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজকে দুর্নীতি যেন গ্রাস করে ফেলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে দুর্নীতি কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। এতে অবশ্য বিক্ষুব্ধ হচ্ছে সকল স্তরের মানুষ। দুর্নীতির মুলোৎপাটন করাই হবে সরকারের সুদৃঢ় নীতি। আর কোন দুর্নীতিবাজকেই বিচারের হাত থেকে রেহাই দেয়া যাবে না।

পৃথিবী আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌচেছে। নারী আর পুরুষ সমান মর্যাদায় সমাসীন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করেছে। অথচ এ পর্যায়ে এসেও আমরা নারীর মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। নির্যাতিতা হচ্ছে নারী সমাজ, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ছাত্রীগণ। বাংলাদেশের মহিলাগণ নানাভাবে চরম নির্যাতনের শিকার। নারী নির্যাতনের অন্যতম শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় তারা নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত। গা শিউরে ওঠে লোমহর্ষক ধর্ষণের খবর পেয়ে। প্রতিনিয়ত খবর আসছে বিয়েতে রাজী না হওয়ায় ছাত্রী অপহরণ বা এসিড নিক্ষেপের। কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে অভিভাবকের উদ্বেগের সীমা নেই। সবাই আতংকিত, কখন না জানি কোন দুঃসংবাদ আসে তার প্রাণ প্রিয় সন্তানের জন্য।

নারী নির্যাতন করে, ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনা রেখে, পদে পদে তাদের লাঞ্ছিত করে সভ্য সমাজ আশা করা যায় না। মানব সম্পদের বিকাশ কামনা করা যায় না। একদিকে নারী শিক্ষা, নারী সমানাধিকার কথা বলা, অন্যদিকে তাদের নিরাপত্তাহীনতায় রাখা কোন দায়িত্বশীলতার কাজ নয়। যে সব নারী শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, শত সামাজিক বাধা পেরিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে আসছে, তাদের নির্যাতন করা ঘৃণ্য অপরাধ। এর শাস্তি হওয়া উচিৎ আরও কঠোর। কারণ এ অপরাধে শুধু নারীই নির্যাতিতা হচ্ছে না-সমাজ প্রগতি ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই সমাজ প্রগতি, নারী শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়নের প্রয়োজনে আইনগত প্রশাসনিক-সামাজিক শক্তিতে ছাত্রীদের তথা সমগ্র নারী সমাজকে রাখতে হবে নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত।

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা, গণতন্ত্রকে সবল করা আর সন্ত্রাসকে নির্মুল করা, সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন নাগরিকের কর্তব্যবোধ, সচেতনতাবোধ এবং তাদের দেশপ্রেম। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ও সম্পদ। দেশপ্রেমের মূলেই আছে মানুষকে ভালবাসা। কবির ভাষায়-

"মিছা মনি মুক্ত হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন আর নাই।"

যিনি কেবল নিজের দেশকে ভালবাসেন তিনি দেশপ্রেমিক। আর যিনি সমগ্র পৃথিবীকে এবং মানুষকে ভালোবাসেন তিনি আরও মহৎ। আমরা বাঙালী-বাংলাদেশী। প্রায় দু শ' বছর ইংরেজকর্তৃক শাসিত ও শোষিত, পঁচিশ বছর বর্বর পাকিস্তানীদের দ্বারা নির্যাতিত। তিরিশ লক্ষ বাঙালী তাঁদের বুকের রক্তের আখরে আমাদের স্বাধীনতার দীপ্তশিখা জ্বালিয়ে গেছেন। দেশপ্রেমিক বাঙালী, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, শ্রমিক-মজুর নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ নয় মাস চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের দেশপ্রেম তুলনাহীন। এঁদের দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়ে আসে। দেশ প্রেম আমাদের জীবন, আমাদের মরণ।

এখন সময় এসেছে দেশ গড়ার। দেশকে গঠনমুলক পরিকল্পনা দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের উন্নতির জন্য শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজন। নাগরিকদের তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো, সরকারি আদেশ-নিষেধ পালন করা সকল নাগরিকের কর্তব্য মনে করতে হবে। অনেক স্বার্থপর লোক স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অনাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। নাগরিকগণ তা রোধ করবে। চোরাচালান, কালোবাজারী, দুর্নীতিপরায়নতা রোধ করার দায়িত্বও নাগরিকদের। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার দেশ শুধু সরকারের নয়, দেশ জনগণের। দেশের কল্যাণের কথা নাগরিককেই ভাবতে হবে, সরকারের একার পক্ষে যা কখনই সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা যদি অর্থবহ করে তোলা যায়, যদি সকলের কাছে স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দেয়া যায়, তবেই স্বাধীনতা অর্জনের ত্যাগ এবং তিতীক্ষা সার্থক হবে। আর এভাবেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সপ্ন সফল হবে। স্বাধীনতা নামক পরশমণির পরশে আমরা খাঁটি মানুষ হব, এর পরশে আমাদের দুঃখ কেটে যাবে। আমরা বলতে পারব-

"স্বাধীনতার পরশমণি সবাই ভালবাসে
সুখের আলো জ্বালায় বুকে-দুঃখের ছায়া নাশে।"

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পঠিত (ঈষৎ সংশোধিত)।